Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – I, Issue-I, published on January 2021, Page No. 1 –8
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 - 0848

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতির চণ্ডীমঙ্গলকাব্য : একটি তুলনামূলক অধ্যায়ন

প্রসেনজিৎ রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: proy16542@gmail.com

Keyword
বাংলা মঙ্গলকাব্য, মনসামঙ্গল, গ্রন্থোৎপত্তি, শাপভ্রষ্ট দেবতা, বন্দনা, বারোমাস্যা

Abstract

ভূমিকা: চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আমাদের 'মঙ্গলকাব্য' সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার, অর্থাৎ মঙ্গলকাব্য কি? এ প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা মঙ্গলকাব্য। যা মূলতঃ খ্রীষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফসল। ড.অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' বইতে মঙ্গল কাব্য বলতে বুঝিয়েছেন বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা প্রচার সম্মন্ধীয় এক প্রকার আখ্যানকাব্যকে। মানুষ বিপদে পড়লে দেব-দেবীদের শরণ করেন। বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলির উৎপত্তির মূলে এই ধরনের আপদ-বিপদের প্রভাব আছে। যেমন– সাপের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সর্পদেবী মনসার পূজা, তেমনি হিংস্র পশুর হাত থেকে রক্ষা পেতে দেবী চণ্ডীর পূজা। সাধারণ ভাবে বলা যায় বেশীর ভাগ মঙ্গল কাব্যেই দেবীর পূজা প্রচারিত হয় এবং এই পূজা প্রচারের জন্য কোন না কোন ভক্তকে অভিশাপ প্রাপ্ত হতে হয়ে আসতে হয় মর্ত্যে। কার্য সমাপ্ত ঘটলে তারা আবার ফিরে যান স্বর্গে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দেব-দেবীর প্রচারমূলক এক বিশেষ সাহিত্য শাখা হল 'মঙ্গলকাব্য'। এই মঙ্গলকাব্যগুলি যারা শুনতেন বা যারা শোনাতেন, সকলেরই মঙ্গল হত। এই মঙ্গল কাব্য ধারায় যে মঙ্গলকাব্যগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, সেগুলি হল- মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন ও অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি। এই সব মঙ্গলকাব্যগুলি মোটামুটি ভাবে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর সময়কালে রচিত হয়েছিল। এই দীর্ঘ সময়কালে শাসক সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের মূল কাঠামো এক থাকলেও সামাজিক রীতি-নীতি, খাদ্য, পোষাক, আচার-আচরণের বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে।

১.০. দেবী চণ্ডী ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্য : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দেবীকে পূজা করা আজকের রীতি নয়, প্রাচীনকাল থেকে নারীশক্তিকে পূজা করার রীতি প্রচলিত আছে। এই দেবী পূজার প্রচলন ভারতে প্রায় বৈদিক সভ্যতার আগের

থেকেই প্রচলিত ছিল। আদিরূপে দেবী ছিলেন মাতা পৃথিবী। ঋগবেদের প্রথম, ষষ্ঠ ও দশম মণ্ডলে মাতা পৃথিবীকে বন্দনা করার কথা বলা আছে। মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীরা গড়ে উঠেছেন মূলতঃ আর্য ও আর্যেতর উপাদানের সংমিশ্রণের ফলে। আমাদের আলোচ্য দেবীচণ্ডীও এই আর্য ও আর্যেতর সংমিশ্রণের ফল। 'চণ্ডী' শব্দটি মূলতঃ দ্রাবিড় শ্রেণির ভাষা থেকে আগত। মূল শব্দটি হল 'চাণ্ডী'। পরবর্তীকালে প্রাচীন সংস্কৃতে তা হয়ে যায় চণ্ডী, চণ্ডিকা বা চণ্ডা ইত্যাদি। তবে কেউ কেউ মনে করেন 'চণ্ডী' শব্দটি মুণ্ডা ভাষা থেকে আগত। মুণ্ডা জাতিভুক্ত ওরাওঁ জাতির লোকেরা 'চাণ্ডী' নামে এক দেবীকে পূজা করে থাকে। এই দেবীচণ্ডীকে পূজা করার উদ্দেশ্য হল, "চণ্ডী ভীষনা প্রকৃতির দেবী, তাঁহার নিকট হইতে অমঙ্গলেরই আশঙ্কা বেশি– সেই জন্য তাঁহাকে প্রসন্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে কিংবা তাঁহার অপ্রিয় নামটি এড়াইবার প্রবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ একটি বিপরীতার্থক শব্দ দ্বারা তাঁহার উল্লেখ করা হয়। ইহাকেই ইংরেজিতে euphemism বলে।"[১] এই চণ্ডী আদিবাসী সমাজের অবিবাহিত ওরাওঁ যুবকদের প্রধান দেবতা। ইনি প্রসন্ন হলে পশু শিকারে জয় লাভ করা যায়।

বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে মনসামঙ্গল কাব্য সর্বপ্রাচীন হলেও সর্বপ্রধান মঙ্গল কাব্য হল চণ্ডীমঙ্গল। এই কাব্যটি বাঙালি সমাজে জনপ্রিয়তার বিচারে অনেক উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেরও মূল বিভাগ দুটি – দেবখণ্ড ও নরখণ্ড। দেবখণ্ডের মধ্যে আছে – সৃষ্টিতত্ত্ব, হর-পার্বতীর সংসার, নীলাম্বরের অভিশাপ ও মর্ত্যে আগমনের কাহিনি। অন্যদিকে নরখণ্ডে আছে আরও দুটি উপবিভাগ – আক্ষেটিক খণ্ড ও বণিক খণ্ড।

২.০. কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি: শুধু মধ্যযুগের সাহিত্যেই নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী। তিনি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ক্ষেত্রে দক্ষিণবঙ্গীয় ধারায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে আছেন। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'অভয়ামঙ্গল'। তিনি তাঁর কাব্যে দুটি পর্যায়ে নিজের আত্মজীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন। কবির দামিন্যার পুথিতে যে বংশপরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায় যে কবি রাঢ়ী শ্রেণির কয়ড়ি কুলে সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। কবির পিতা গুণরাজ মিশ্র। কবির আত্মকাহিনিতে জানা যায়, সেলিমাবাদ শহরের নিবাসী গোপীনাথ নন্দী নিয়োগীর প্রজা রূপে তারা কয়েক পুরুষ ধরে দামুন্যায় বসবাস করত। কিন্তু ডিহিদার মামুদ সরিফ ও তার সহযোগীদের উৎপীড়নের ফলে গোপীনাথ নন্দী বন্দী হন। তখন তারা হিতৈষী শ্রীমন্ত খাঁ ও গ্রামের মণ্ডলের সঙ্গে পরামর্শ করে সপরিবারে অজানা আশ্রয়ের আশায় পৈত্রিক নিবাস ত্যাগ করেন। পথের মধ্যে নানান বিপত্তি ও শেষে পথের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে দেবীচণ্ডী স্বপ্নে কবিকে 'চণ্ডীমঙ্গল' রচনার নির্দেশ দেন। কবি শিলাই নদী পার হয়ে ব্রাহ্মণভূমি রাজ্যের রাজধানী আড়রাতে রাজা বাঁকুড়া রায়ের কাছে আশ্রয় পান এবং রাজার পুত্র রঘুনাথের গৃহ শিক্ষক রূপে নিযুক্ত হন। কবি গ্রন্থ মধ্যে জানিয়েছেন, রাজা রঘুনাথ রায় রাজা হলে তার অনুরোধে কবি 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন।

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে দক্ষিণবঙ্গীয় কাব্যধারার একজন অন্যতম কবি হলেন রামানন্দ যতি। রামানন্দ যতি নামটির মধ্যে অবস্থিত 'যতি' অংশটি সন্ন্যাসীসূচক। এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাওয়া পুঁথি থেকে জানা যায়, সেখানে লেখা ছিল 'রামানন্দ গোস্বামী'। তা থেকে মনে হতেই পারে তিনি হয়তো পরবর্তীকালে সন্ন্যাস জীবনে প্রবেশ লাভ করেছেন। তাঁর রামভক্তির প্রমাণ তার চণ্ডীমঙ্গলের নানান স্থানে পাওয়া যায়–

"শ্রীরামানন্দের বিরচন।
যিনি রাম তিনি চণ্ডী ভেদ নাহি জানি দণ্ডী
সংস্কৃত ভাষাও তেমন।"[২]

কবি রামানন্দ যতি তার চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন মুকুন্দের কাব্যের গ্রাম্যতা থেকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকে উদ্ধার করার পরিকল্পনা নিয়ে। তাঁর রচিত চণ্ডীমঙ্গলের মোট দুটি পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। তারমধ্যে একখানি মূল পুঁথি, যা পরবর্তীকালে লেখক স্বহস্তে সংশোধিত এবং অন্য একটি পুঁথি তার ভক্তশিষ্য কতৃক নিজস্ব রচনার সংযোজনসহ পুনঃলিখিত। তাঁর কাব্যের মধ্যে ব্যক্তি পরিচয়ের কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে একটি শ্লোকে তিনি জানিয়েছেন–

"গজ বসু ঋতু চন্দ্র শাকে গ্রন্থ হয়।
চণ্ডীর আদেশ পায়্যা রামানন্দ কয়।।"[৩]

রামানন্দ যতি তাঁর কাব্যের মধ্যে নিজের পরিচয় তেমন ভাবে না দিলেও তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্য মধ্যে পাই –

"সংসার অনল তাপ কত সব আর।
কিবা জানি অপরাধ কর্য়াছি তোমার।।
শোক না করিস মা থাকিব তোর কাছে।
আমা হেন কোটি কোটি সুত তোর আছে।।"[৪]

তিনি যে মাতা-পিতার স্নেহাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর কাব্যে কালকেতুর উপাখ্যানের মধ্যে, -

"খেদাইয়া দিল মায় পিতা না শুধান তায়
এই লাজে নাহি দেয় দেখা।"[৫]

৩.০. দুই কবির কাব্যের রচনাকাল : কবি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচনাকাল বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। তার কাব্যের রচনাকাল বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে বিভিন্ন পুথির রচনাকাল জ্ঞাপক শ্লোকগুলির কথা উল্লেখ করতেই হয়। তাঁর কাব্যে প্রথম যে রচনাকালটি পাওয়া যায় –

"শাকে রস রসে বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত মত দিলা গীত হরের বণিতা।।"[৬]

অর্থাৎ ১৪৬৬ শকে (১৫৪৪-৪৫ খ্রিস্টাব্দ) কবি মুকুন্দ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি রচনা করেছেন। সুকুমার সেন ১৫৪০-৪৫ খ্রিস্টাব্দকে মুকুন্দের দামিন্যা ত্যাগ ও কাব্য রচনার সময়কাল বলে মনে করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে কবির জন্ম ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দ বা গ্রন্থ রচনার কাল ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দ। তিনি 'রস' কে '৬' না ধরে '৯' ধরেছেন। অন্য দিকে আবার মঙ্গলকাব্য বিশেষজ্ঞ আশুতোষ ভট্টাচার্য কাব্যটির কাল ১৫৯৪-১৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বলে মনে করেন।

রামানন্দ যতির চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনার কাল বিষয়ে কোনরকম মতানৈক্য দেখা যায়নি। কারণ তিনি তাঁর কাব্যের মধ্যে ব্যক্তি পরিচয়ের তেমন উল্লেখ না করলেও তিনি কাব্য রচনাকাল বিষয়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। আমরা তা থেকে বুঝতে পারি কবি রামানন্দ যতি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একজন কবি ছিলেন। রামানন্দ যতি তাঁর কাব্য রচনা সমাপ্ত করেছেন ১৬৮৮ শকে অর্থাৎ ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে।

"গজ বসু ঋতু চন্দ্র শাকে গ্রন্থ হয়।
চণ্ডীর আদেশ পায়্যা রামানন্দ কয়।।"[৭]

অর্থাৎ গজ=৮, বসু=৮, ঋতু=৬, চন্দ্র=১ হিসেবে ধরলে দাঁড়ায় ৮৮৬১। তা উল্টে দিলে হবে ১৬৮৮ শকাব্দ (১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দ)।

৪.০। দুই কবির চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের তুলনা :

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য একটি আখ্যানধর্মী কাব্য। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনি রচনায় প্রত্যেকে প্রায় একই কাঠামোকে বজায় রেখেই নিজগুণে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন। মঙ্গলকাব্য ধারায় এই কাব্যখানি নিঃসন্দেহে এক আসামান্য সৃষ্টি। শুধুমাত্র মধ্যযুগীয় ভাবধারা নয়, কাহিনি রচনায় প্রকাশ পেয়েছে আধুনিকতার লক্ষণও। একদিকে যেমন কবি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য বিশেষ সাহিত্য মর্যাদা লাভ করেছে তাঁর নিজের রচনাগুণে, তেমনি অন্যদিকে রামানন্দ যতির চণ্ডীমঙ্গল কাব্যও। রামানন্দ যতি মুকুন্দের প্রায় দুই শতান্দী পরের কবি। তিনি যেমন ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য পাঠ করেছেন, তেমনি

তার উল্লেখও করেছেন তাঁর কাব্য মধ্যে। তাঁর কাব্যে গ্রাম্যতা নয়, প্রাধান্য পেয়েছে আধুনিকতা। তিনি মূলত একনিষ্ঠ সাধক কবি।

৪.১। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কাব্যকাহিনি :

কবি মুকুন্দ তাঁর কাব্যখানিকে মূলত তিনটি কাহিনিতে বিভক্ত করে নিয়েছে– প্রথম পর্যায়ে আছে শিব ও পার্বতীর আখ্যান, দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে কালকেতুর আখ্যান, এবং তৃতীয় পর্যায়ে আছে ধনপতির আখ্যান। অন্যদিকে আবার মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যকে মঙ্গলকাব্যের বিচারে চার ভাগে ভাগ করা যায়-

৪.১.১। প্রথম ভাগ বন্দনাংশ : যেখানে আছে উপাস্য দেবদেবীদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। যেমন – গণেশ বন্দনা, সূর্য্য-বন্দনা, সরস্বতি বন্দনা, মহাদেব বন্দনা, লক্ষ্মী বন্দনা, রাম বন্দনা, চণ্ডী বন্দনা। এই অংশটি যেন দৈবীলীলার অতিপ্রকাশ। সুকুমার সেন এই অংশটির সম্পর্কে বলেছেন- "বন্দনা অংশের সহিত কাব্য কাহিনির কোন যোগ নাই, আনুষ্ঠানিকভাবে গীত হইবার বেলায় দেবতা-বন্দনা প্রথমেই আবশ্যক, তাই এই অংশ 'স্থাপনা পালা'।"[৮]

মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলের শুরুতেই আছে গণেশ বন্দনা। দেবী চণ্ডীকে তুষ্ট করার জন্য দেবগণ গণেশের পুনর্জীবন দান করেন। সে সময় থেকেই শিবের বরে গণেশ সর্ব পুজার আগে স্থান পান। পুরানে গণেশকে নিয়ে বহু আখ্যান প্রচলিত আছে। ফলত গণেশকে নানা জায়গায় নানা রুপে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন– হরিদ্রা গণেশ, চৌর গণেশ ইত্যাদি। চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে পাই–

"অঙ্গের বন্ধুক-ছটা অজানুলম্বিত জটা
শশিকলা মুকুট-মণ্ডন।
চরণ-পঙ্কজ-রাজে কনক নূপুর বাজে
অঙ্গদ বলয়া বিভূষণ।"[৯]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'সূর্য্য-বন্দনা' অংশে আমরা পাই –

"বন্দো কমলীনী বন্ধু অসেস গুণের সিন্ধু
যগত অধিপ নিরঞ্জন।
করবর পদ্মধর অরুণাং রুচিবর
দিপ্ত করে শকল ভূবন।।"[১০]

এবং সবশেষে আছে দিক বন্দনা।

৪.১.২। দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থোৎপত্তির কারণ : যেখানে আছে কবির আত্মপরিচয় জ্ঞাপক শ্লোক ও কাব্যরচনার ইতিহাস। এই অংশটি প্রত্যেক মঙ্গল কাব্যের মধ্যে উপস্থিত থাকা যেন আবশ্যিক প্রথা। এই অংশটিকে দুইটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে, যথা- প্রথম অংশে কবির বংশপরিচয় এবং দ্বিতীয় অংশে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনার উদ্দেশ্য। এক কথায় বলা যায় কবি মুকুন্দ তাঁর কাব্যের আত্মকাহিনিতে জানিয়েছেন সঙ্কটে পড়ে কবির দামুন্যা ত্যাগ, পথের মধ্যে নানান বিপদ, নিষ্করুণ দারিদ্র, এবং পথের মধ্যে কবি ঘুমিয়ে পড়লে দেবী তাকে স্বপ্নে কাব্যরচনার আদেশ দেন। সবশেষে তিনি বাঁকুড়া রায়ের কাছে আশ্রয় লাভ করেন। কবির আত্মপরিচয় অংশে জানতে পারা যায়, তিনি তাঁর দুঃখময় জীবনের কথা লিখেছেন তাঁর কাব্যে –

"তৈল বিনা কৈল স্নান করিল উদক পান
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।।"[১১]

রাজা কবিকে আশ্রয় দিয়ে পুত্র রঘুনাথের শিক্ষক হিসাবে তাঁকে নিয়োগ করেন। রঘুনাথের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত মুকুন্দ তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা শেষ করেন।

৪.১.৩। তৃতীয় ভাগ দেবখণ্ড : এখানে পৌরাণিক ও লৌকিক দেবতার সমন্বয় স্থাপন করা হয়েছে। এই অংশে আছে সৃষ্টিপালা, অর্থাৎ দেব-দেবী, জগৎ সৃষ্টি বিষয়ক কাহিনি। শিব কাহিনি অংশে ভৃগু মুনির যজ্ঞ, গৌরীর দক্ষালয় গমন, গৌরীর নিবেদন অংশ, দক্ষের শিব নিন্দা, সতীর দেহত্যাগ, দক্ষ-যজ্ঞ ভঙ্গ, গৌরীর জন্ম, হর-গৌরীর বিবাহ, দেবীর আজ্ঞায় পুরী নির্মাণ, কলিঙ্গ রাজের স্বপ্নাদেশ, পশুদের প্রতি দেবীর বরদান, ইন্দ্রের শিব পূজার উদ্যোগ, নীলাম্বরের পুষ্পচয়ন, নীলাম্বরকে মহাদেবের অভিশাপ ইত্যাদি।

কবি কঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী দেব খণ্ড রচনায় মঙ্গলকাব্যের প্রথাকে কোন ভাবেই ক্ষুন্ন করেননি। হর-পার্বতীর বিবাহ ও পরবর্তী সংসার জীবন বর্ননায় কবি নিপূন কবি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, শিব-উমার ঘরজামাই থাকা এবং সেই বিষয় নিয়ে মায়ের সাথে উমার কলহ। এই ঘটনা যেন মধ্যবৃত্ত পারিবারিক জীবনচিত্রকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। কবি তাঁর কাব্যের মধ্যে লিখছেন–

"মিথ্যা কাজে ফিরে পতি নাঞি চাষবাস
ভাত কাপড় কত না জোগাব বার মাস।"[১২]

এবং এই দেব খণ্ডের শেষ পর্যায়ে দেখা যায় নিলাম্বর অভিশাপ গ্রস্থ হয়ে মর্ত্যে কালকেতু নাম নিয়ে জন্ম নেয়, অন্যদিকে ছায়া মর্ত্যে ফুল্লরা রুপে জন্ম নেয়।

৪.১.৪। চতুর্থ ভাগ নরখণ্ড : যেখানে শাপভ্রষ্ট দেবতার মর্ত্যে আগমন এবং ইষ্টদেবতার পূজা প্রচারের পর আবার তাদের স্বর্গে আগমনের আহিনি বর্নিত হয়েছে। এই পর্যায়ের কাহিনিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, অর্থাৎ দুটি কাহিনির সমন্বয়। একদিকে আছে কালকেতুর উপাখ্যান, যার আর এক নাম আক্ষেটিক খণ্ড বা ব্যাধ খণ্ড। আর অন্যদিকে আছে বণিক খণ্ড। প্রথম ভাগে আছে কালকেতুর কাহিনি, সেখানে প্রথমেই রয়েছে নিদয়ার সাধভক্ষণের কথা –

"নয় মাসে নিদয়ারে সাধ দেই ব্যাধ
নিদয়া স্বামীরে কহে ভাবিয়া বিষাদ।"[১৩]

এর পর এক এক করে কালকেতুর জন্ম, বিবাহ, কালকেতুর মৃগয়া, কালকেতুর ভোজন, চণ্ডীর নিকট পশুগণের দুঃখ নিবেদন, পশুগণের ভগবতীর অভয় দান ও গোধিকারুপ ধারণ, ফুল্লরার খেদ, ফুল্লরা ও কালকেতুর কথাবার্তা, ভগবতীর নিজ রূপ ধারণ, ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ, দেবীর শতনাম কথন, মহিষমর্দিনীর রূপধারণ, কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি, গুজরাট নগর নির্মান, ভারুদত্তের প্ররোচনায় কলিঙ্গ রাজের সঙ্গে যুদ্ধ ও কালকেতুর কারাদণ্ড, কলিঙ্গরাজাকে চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ, কালকেতুর মুক্তি, ভাঁড়ুদত্তের মস্তক মুণ্ডন, কালকেতুর শাপান্ত, কালকেতুর প্রতি স্বপ্নাদেশ, নীলাম্বরের স্বর্গারোহন।

দ্বিতীয় ভাগে আছে বণিক খণ্ড। দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় অপ্সরা রত্নমালা নৃত্য প্রদর্শনকালে নৃত্যের তাল ভুল করলে চণ্ডী তাকে অভিশাপ দেন। সেই অভিশাপ মতো পৃথিবীতে দেবীর পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে রত্নমালা ইছানি নগরে বণিক লক্ষপতির ঘরে খুল্লনা রূপে জন্মলাভ করেন। এরপর এক এক করে পায়রা বাজি, খুল্লনার বিবাহ প্রস্তাব, ধনপতির গৌড়যাত্রা, খুল্লনার নির্যাতন, ছাগল চড়ানো, দেবী চণ্ডীর অনুগ্রহ, ধনপতির প্রত্যাবর্তন, সংসার সুখ, খুল্লনার উৎসব, মালাধরের শাপপ্রাপ্তি, ধনপতির সিংহল যাত্রা, কমলে কামিনী দৃশ্য, সিংহলে ধনপতির নিগ্রহ, শ্রীপতির জন্ম, শ্রীপতির সিংহল যাত্রা, কমলে-কামিনী দর্শন, শ্রীপতি নিগ্রহ, দেবীচণ্ডীর উদ্যোগ, সকলের উদ্ধার ও পিতাপুত্রে মিলন, দেশে প্রত্যাবর্তন, শ্রীপতির দ্বিতীয় বিবাহ, প্রথম পত্নীর দুঃখ, অষ্টমঙ্গলা, খুল্লনা ও শ্রীপতির শাপমোচন।

৪.২. রামানন্দ যতির কাব্য কাহিনি : আধুনিক সাহিত্যের ঊষালগ্নে অবস্থান করেও প্রচারের আলোকে আসতে পারেননি অথচ তাঁদের রচনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে আলোড়িত করে রেখেছিলেন, এরকমই একজন স্রষ্টা হলেন কবি

রামানন্দ যতি। তাঁর রচিত মঙ্গল কাব্য অন্যান্য কবিদের মতো পাঠক সমাজে স্থান করে নিতে না পারলেও তাঁর 'চণ্ডীর গীত' কাব্যটি বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে কবি রামানন্দ যতিকে এক ভিন্ন পরিচয় প্রদান করে। কারণ তিনি কাব্যের কাহিনির ক্ষেত্রে পূর্বসূরিদের কাছে ঋণী থেকেও তাঁর কাব্যে নতুনত্ব দেখাতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রত্যেকটি কাহিনি পূর্ণাঙ্গ ও স্বতন্ত্র।

রামানন্দ যতির চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনিকে গঠনগত দিক থেকে বিচার করলে তিনটি আখ্যান উঠে আসে- (ক) শিব-গৌরীর আখ্যান, (খ) কালকেতুর আখ্যান, (গ) ধনপতির আখ্যান। তবে কবি তাঁর নিজস্ব গুণে কাব্যমধ্যে নানান পরিবর্তন এনেছেন। তাঁর কাব্যের কাহিনিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই –

৪.২.১. বন্দনা : যেখানে আছে গণেশ বন্দনা, সরস্বতী বন্দনা, লক্ষী বন্দনা, গৌরাঙ্গের বন্দনা, শক্তি দেবীর পঞ্চরূপের বন্দনা, জগন্নাথ বন্দনা, নরসিংহ হরি বন্দনা ইত্যাদি। কবি রামানন্দ যতি তাঁর কাব্যের মধ্যে দেবী বন্দনায় পুরাণ ও তন্ত্রের ধারাকেই বহন করেছেন। গণেশ বন্দনায় লিখছেন-

"গজানন রূপ ধরি ব্রহ্মময় অবতরি
চতুর্ভুজ বিঘ্নবিনাশন
প্রভাত অবুতভানু নিন্দিয়া সুন্দরতনু
কোটি চন্দ্র প্রকাশবদন।।"[১৪]

৪.২.২. গ্রন্থোৎপত্তির কারণ : এই পর্বে তাঁর কাব্য রচনার কারণ সম্পর্কে জানিয়েছেন। অন্যান্য কবিদের মতো রামানন্দ যতি নিজের আত্মপরিচয় দেননি। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন যে তিনি মুকুন্দের কাব্যের সমালোচনা করতেই অর্থাৎ মুকুন্দের কাব্যের ভুলগুলিকে চিহ্নিত করতেই এই ভক্তি শাস্ত্র রচনা করেছেন। রামানন্দ যতি মনে করেন মুকুন্দকে চণ্ডীর স্বপ্নাদেশের ঘটনা মিথ্যা। তাই গ্রন্থোৎপত্তিতে রামানন্দ যতি লিখছেন –

"চণ্ডী যদি দেন দেখা তবে কি তা জায় লেখা
পাঁচালীর অমনি বচন।
বুদ্ধি নাই জার ঘটে তারা বলে সত্য বটে
পথে চণ্ডী দিলা দরশন।।"[১৫]

৪.২.৩. দেবখণ্ড : এই পর্বে মুকুন্দের মতোই রামানন্দ দেব-দেবীর সম্পর্কিত কাহিনি বর্ননা করেছেন। দেবখণ্ডের শুরুই হয়েছে 'সৃষ্টি' বর্ণনার মধ্য দিয়ে। শিবের কাহিনি অংশে ভৃগু মুনির যজ্ঞ, দক্ষের শিব নিন্দা, সতী দক্কালয়ে গমন, সতীর নিবেদন, দক্ষের শিবনিন্দা, সতীর দেহত্যাগ, দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ, হর-গৌরীর বিবাহ, গৌরীর পূজা, শবের উপদেশ, ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে মহাদেবের অভিশাপ ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে দেবখণ্ডে। রামানন্দ যদি এই অংশে দক্ষযজ্ঞ বিনাশের দৃশ্যটিকে তুলে ধরতে গিয়ে যেন হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন –

"দেখ্যা দ্বিজগুণ স্ব করে হায় হায়।
পৈতা দেখাইয়া সবে পলাইয়া যায়।।
কেহ বলে আমার নৈবেদ্য নিলে কেবা।
কেহ বলে আমার সন্দেশগুলি দেবা।।"[১৬]

৪.২.৪. নরখণ্ড : এই পর্বে মুকুন্দের কাব্যেই মতোই রামানন্দের কাব্যেরও দুটি বিভাগ পাওয়া যায়, যাথা – আক্ষটি খণ্ড বা ব্যাধ খণ্ড, এবং বণিক খণ্ড। তবে রামানন্দ যতি তাঁর কাব্যের ব্যাধ খণ্ডটি মুকুন্দের মতো প্রসস্ত করেননি। কাহিনিতে নীলাম্বর কালকেতু রূপে ধর্মকেতুর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন, তারপরেই ফুল্লরার সহিত কালকেতুর বিবাহ। এই অংশে

মুকুন্দের কাব্যের মতো পশু গণের গহারি অংশটি নাই। দেবী পশুদের ডাকে সাড়া দিয়ে গোধিকা রূপ ধরেন। কালকেতু সেই গোধিকাকে নিজের ঘরে নিয়ে আসেন। এই পর্বে কবি রামানন্দ যতি দেবী চণ্ডীর বিচিত্র রূপের বর্ণনা দিয়েছেন। যেখানে দেবীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শিত হয়েছে। ফুল্লরার বারোমাস্যার কথাও এই কাব্যে আছে –

"দুঃখের নাহিক সীমা কি কহিব আন।
আমানি খাবার গর্ত দেহ বিদ্যমান।।"[১৭]

ফুল্লরা দেবীর পরিচয় জানতে চাইলে দেবী ছলনার মাধ্যমে নিজের আত্মপরিচয় দিয়েছেন। এরপর একে একে কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি, গুজরাট নগর নির্মাণ, ভাঁড়ুদত্তের আগমন, কালকেতুকে ছলনা, কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধ, কলিঙ্গরাজকে দেবীর আদেশ, কালকেতুর রাজ্যপ্রাপ্তি, কালকেতুর স্বর্গে গমন।

বণিক খণ্ডের কাহিনিতে আছে স্বর্গের অপ্সরা রত্নমালা দেবতাদের নৃত্য প্রদর্শন করতে সময় নৃত্যের তাল ভুল করে ফেলে, এই সুযোগে দেবি তাকে অভিশাপ দেন। ইছানী নগরে লক্ষ্মীপতির ঘরে রত্নমালা ফুল্লরা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। উজানী নগরে ধনপতি সদাগরের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। তারপর ধনপতির বাণিজ্যযাত্রা, খুল্লনার নির্যাতন, ছাগল-চড়ানো, ধনপতির ফিরে আসা, খুল্লনার উৎসব, খুল্লনার পরীক্ষা, ধনপতির সিংহল যাত্রা, কমলে-কামিনীর দৃশ্য, দেবীর উদ্যোগ, সিংহল রাজার নতি স্বীকার, ধনপতির উদ্ধার, পিতাপুত্রের মিলন, দেশে প্রত্যাবর্তন, দেবীর আনুকূল্য, শ্রীপতির দ্বিতীয় বিবাহ, প্রথম পত্নির দুঃখ, খুল্লনা ও শ্রীপতির শাপমোচন ইত্যাদি কাহিনি বর্নিত আছে।

৫.০. দুই কবির কাব্যের চরিত্রগত ও শৈলীগত তুলনা : বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসে কাহিনি নির্ভর রচনায় চরিত্র একটি বিশেষ গুরুপ্তপূর্ণ বিষয়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দুই কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি নিজ সাহিত্য সৃষ্টির গুণে তাঁদের কাব্যের চরিত্রগুলিকে গড়ে তুলেছেন। মুকুন্দের কাব্যের কালকেতু, ফুল্লরা, মুরারি শীল, ভাঁড়ুদত্ত প্রভৃতি চরিত্রগুলি যেন একেবারে মাটির মানুষ হয়ে উঠে এসেছে। দেবতারাও যেন এই সাধারণ মানুষদের মতোই বিচরণ করেছেন তাঁর কাব্যে। অন্যদিকে রামানন্দ যতির কাব্যের চরিত্রগুলির মধ্যে অনেক বেশি রসবোধ লক্ষ্য করা যায়। দেব-দেবীর চরিত্র সৃষ্টিতেও কবি রামানন্দ যতি কোন অসম্পূর্ণতা রাখেননি। তিনি তাঁর কাব্যের দেব চরিত্রগুলিকে ভক্তি শ্রদ্ধায় যেন ভড়িয়ে দিয়েছেন।

শৈলীগত আলোচনায় প্রথমেই বলে নিতে হয় যে, মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি এই দুই কবিই দুইটি ভিন্ন শতাব্দীর কবি। তাই স্বাভাবিক ভাবেই দুই কবির রচনার মধ্যে শৈলীগত অনেক পার্থক্য থাকবেই। সে কারণেই দুই কবির কাব্যে দেবীর প্রতি নিবেদনের ভাব আলাদা। কবি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাৎসল্য রসের আধিক্য রামানন্দ যতির কাব্যের তুলনায় অনেক কম। সবশেষে বলতে হয় এই ভিন্ন দুই শতাব্দীর কবির কাব্যের মধ্যে তুলনা থাকলেও মঙ্গল কাব্যের গঠনকে দুই কবিই বজায় রেখেই তাঁদের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন। তাতে দুই কবির কাব্যই নিজ রচনাগুণে অসাধারণ সাহিত্য সৃষ্টি রূপে বাংলা মঙ্গলকাব্যে অসামান্য সাহিত্য সৃষ্টিরূপে পরিচিত থাকবে।

তথ্যসুত্র :

১। ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃষ্ঠা-৩৪৬
২। গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ : (সম্পাদিত) রামানন্দ যতি - বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা - ১৫৪
৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ৪০১
৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ৯৩
৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫৮

৬। ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃষ্ঠা-৩৮
৭। গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ : (সম্পাদিত) রামানন্দ যতি - বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা - ৪০১
৮। সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কনিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি -১১০০০১, ভূমিকা
৯। তদেব, পৃষ্ঠা – ১
১০। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, শ্রী বিশ্বপতি (সপমাদিত) : কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২, পৃষ্ঠা – ৩
১১। তদেব, পৃষ্ঠা – ৩১
১২। সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কনিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি -১১০০০১, পৃষ্ঠা – ২৫
১৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৯
১৪। গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ : (সম্পাদিত) রামানন্দ যতি - বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা - ১০২
১৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ১০২
১৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ১১৯
১৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৬০